আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিবেদন- ২০০৯

বাংলাদেশ

বাংলাদেশের সংবিধানে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তবে শাসনতন্ত্রে এই মর্মে বিধান রাখা হয়েছে যে, আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা সাপেক্ষে যে কোন ব্যক্তি তার নিজ পছন্দ অনুসারে যে কোন ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন, পালন ও প্রচার করতে পারবেন। এখানে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অথবা এদের কোন অংশের নিজ নিজ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন, পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনা করার অধিকার রয়েছে। সরকার প্রকাশ্যে ধর্মীয় স্বাধীনতা সমর্থন করলেও যে সময়কালের ঘটনাবলির আলোকে এই প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে সে সময়ে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর আঘাত একটা সমস্যা হিসেবে বিরাজমান ছিল। বর্তমান প্রতিবেদনের সময়কালে আহমদিয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কোন বিক্ষোভ প্রদর্শন, বা তাদের কোন প্রতিষ্ঠানের ওপর হামলা চালানোর চেষ্টা করার খবর পাওয়া যায়নি, তবে তাদের ওপর হয়রানির বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘঠেছে। আহমদিয়াদের অমুসলিম ঘোষণা করার দাবি মাঝে মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে উঠেছে, তবে সরকার বরাবর আহমদিয়া সম্প্রদায়ের লোক ও তাদের বিষয়-সম্পত্তি রক্ষায় কার্যকরভাবে পদক্ষেপ নিয়েছে। রাজনীতির ওপর ধর্ম যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ইসলামি চেতনার প্রতি সংবেদনশীল ছিল।

প্রতিবেদনে বিবেচ্য সময়কালে ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রতি সরকারের শ্রদ্ধাবোধের মাত্রায় কোন পরিবর্তন হয়নি। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ব্যাপক সমর্থনপুষ্ট, এবং ঘোষিত ধর্মনিরপেক্ষ দল আওয়ামী লীগ ২০০৮ সালের ২৯শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ক্ষমতায় আসে। এটি ছিল ২০০১ সালের পর অনুষ্ঠিত প্রথম সংসদীয় নির্বাচন। এই নির্বাচনে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর সহিংসতার বা ভয়-ভীতি প্রদর্শনের মত তেমন ঘটনা ঘটেনি, যেমনটা আগের নির্বাচনগুলিতে হয়েছিল। নতুন সরকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কয়েকজনকে উচ্চপর্যায়ের নেতৃত্বে নিয়োগ দেয়। মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার মাদ্রাসার পাঠ্যক্রম সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে। দেশের নাগরিকরা সাধারণত স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে পেরেছেন, তবে পুলিশসহ সরকারি কর্মকর্তারা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় প্রায়শই অকার্যকর ছিল এবং কোন কোন সময় ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর উৎপীড়ন ও হামলার ক্ষেত্রে ধীরগতিতে তাদেরকে সাহায্য করেছে। সরকার এবং সুশীল সমাজের অনেক নেতা বলেছেন যে, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর উৎপীড়নের পেছনে সাধারণত রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল, শুধুমাত্র ধর্মীয় বিশ্বাস বা ধর্মীয় আনুগত্যের কারণে এসব ঘটেছে - তা বলা যাবে না।

এই প্রতিবেদনে ধরা সময়কালে ধর্মীয় আনুগত্য, বিশ্বাস ও চর্চার ওপর ভিত্তি করে সামাজিক নির্যাতন ও বৈষম্যের খবর পাওয়া গেছে; তবে পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে যে, এ ধরনের ঘটনা পূর্ববর্তী প্রতিবেদন-সময়কালের চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে। সংখ্যালঘু হিন্দু, খ্রিস্টান ও বৌদ্ধরা বৈষম্যের শিকার হয়েছেন এবং কোন কোন সময় সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছেন। আহমদিয়াদের ওপর হয়রানিও অব্যাহত ছিল।

যুক্তরাষ্ট্র সরকার মানবাধিকার উন্নয়নের সামগ্রিক নীতির অংশ হিসাবে বাংলাদেশ সরকারের সাথে ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়ে আলোচনা করে থাকে। সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠকে এবং প্রকাশ্য বিবৃতি

প্রকাশের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের কর্মকর্তারা সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য সরকারকে উৎসাহিত করেছেন। ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার ঘটনাগুলোর বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস প্রকাশ্যে ও ঘরোয়াভাবে নিন্দা জ্ঞাপন করেছে, এবং সকল নাগরিকের জন্য যথাযথ পদ্ধতি নিশ্চিত করার জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানিয়েছে। রাষ্ট্রদূত দেশের বিভিন্ন স্থানে গিয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। এর মধ্যে ছিল জাতীয় নির্বাচনের ঠিক কয়েক দিন আগে দেশের সবচেয়ে বিখ্যাত হিন্দু মন্দির এবং নির্বাচন চলাকালে একটি হিন্দু প্রধান ভোট কেন্দ্র পরিদর্শন। যুক্তরাষ্ট্র সরকার যুক্তরাষ্ট্রের একজন প্রখ্যাত আলেমের বাংলাদেশ সফরের ব্যবস্থা করেন। তিনি শ্রোতাদের সামনে সহিষ্ণুতা ও নারী-পুরুষ ন্যায্যতার ক্ষেত্রে কুরআনের ব্যাখ্যা তুলে ধরেন। এই সফর ছিল অত্যন্ত ফলপ্রসূ।

অনুচ্ছেদ ১: ধর্মীয় জনসংখ্যা তত্ত্ব

বাংলাদেশের আয়তন ৫৫,১২৬ বর্গ মাইল এবং জনসংখ্যা ১৫ কোটি ৪০ লাখ। ২০০১ সালের আদম শুমারির তথ্য অনুযায়ী দেশের ৯০ শতাংশ মানুষ সুন্নি মুসলমান; ৯ শতাংশ হিন্দু, বাকিরা প্রধানত খ্রিস্টান (অধিকাংশ রোমান ক্যাথলিক) এবং থেরভেদ-হিনযান বৌদ্ধ। পার্বত্য চট্টগ্রাম ও উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে উপজাতীয় ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা কেন্দ্রীভূত বেশি, তবে অনেক জায়গায় উপজাতীয় ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা অন্যদের সাথে একই এলাকায় বসবাস করছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় আদিবাসী (অবাঙ্গালি) জনগণের মধ্যেই অধিকাংশ বৌদ্ধ দেখা যায়। বাঙ্গালি ও জাতিগত সংখ্যালঘু আদিবাসী খ্রিস্টানরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে দেশের নানা স্থানে বসবাস করছেন, যেমন- বরিশাল শহর, বরিশালের গৌরনদী, গোপালগঞ্জের বানিয়ারচর, ঢাকার মনিপুরী পাড়া, ঢাকার মহাখালীর খ্রিস্টান পাড়া, গাজীপুরের নাগরী এবং খুলনা শহর। এছাড়াও অল্প সংখ্যক শিয়া মুসলমান, শিখ, বাহাই, অ্যানিমিস্ট বা প্রকৃতি পুজারী ও আহমদিয়া রয়েছেন। এই ধরনের প্রতিটি ধর্মীয় গোষ্ঠীর লোকসংখ্যা আনুমানিক কয়েক হাজার থেকে ১ লাখ পর্যন্ত। এখানে এদেশীয় কোন ইহুদি সম্প্রদায়, এমনকি উল্লেখ করার মত অভিবাসী ইহুদিও নেই। নাগরিকদের সম্প্রদায়গত ও সাংস্কৃতিক পরিচিতির ক্ষেত্রে ধর্ম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল- এমনকি যারা সক্রিয়ভাবে বিভিন্ন প্রার্থনায় বা অন্যান্য ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে অংশ নেন না- তাদের বেলায়ও।

এদেশে বসবাসরত বিদেশী নাগরিকদের বেশিরভাগই বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত। তারা ইসলাম ধর্মের অনুসারী। এছাড়াও, এদেশে প্রায় ৩০ হাজার তালিকাভুক্ত এবং আরো ২ লাখ থেকে ৫ লাখ তালিকাবহির্ভূত ইসলাম ধর্মাবলম্বী রোহিঙ্গা শরণার্থী রয়েছেন - যারা কক্সবাজার এলাকায় থাকেন।

অনুচ্ছেদ ২: ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রতি সরকারের শ্রদ্ধাশীলতা পরিস্থিতি

আইন / নীতিগত কাঠামো

সংবিধানে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, তবে এতে এই মর্মে বিধান রাখা হয়েছে যে, আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা সাপেক্ষে কোন ব্যক্তি তার নিজ পছন্দ অনুসারে যে কোন ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন,পালন ও প্রচার করতে পারবেন। দেশে ধর্মদ্রোহিতা বিরোধী কোন আইন নাই, যদিও ধর্মীয় রাজনৈতিক দলগুলো অঙ্গীকার করে আসছে যে, ক্ষমতায় গেলে তারা এই আইন করবে। ক্ষমতায় আসার পর নতুন সরকার এই ব্যাপারে প্রকাশ্য কোন মন্তব্য করেনি।

সরকার প্রকাশ্যে ধর্মীয় স্বাধীনতা সমর্থন করলেও আলোচ্য সময়কালে ধর্মীয় এবং জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণ ও বৈষম্যের ঘটনা অব্যাহত ছিল। সরকারি প্রতিষ্ঠান ও আদালত আলোচ্য সময়কালে ধর্মীয় স্বাধীনতা সাধারণত রক্ষা করেছে।

শেখ হাসিনা ওয়াজেদের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ ২০০৮ সালের ২৯শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২৯৯টি আসনের মধ্যে ২৩০টি আসনে জয়ী হয়। আন্তর্জাতিক ও দেশী পর্যবেক্ষকরা এই নির্বাচনকে সাধারণভাবে অবাধ ও সুষ্ঠু হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। এই নির্বাচন এবং তৎপরবর্তী সুষ্ঠু ক্ষমতা হস্তান্তরের ফলে অনির্বাচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুই বছরের শাসনের অবসান ঘটে।

সরকার ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী পরিচালনা করেছেন, এবং ইসলাম ধর্মীয় উৎসবের দিন-তারিখ ঘোষণা করেছে, কিন্তু খুতবার বিষয়বস্তু কি হবে তা সাধারণত নির্ধারণ করেনি, ইমাম নির্বাচন করেনি, বা তাদের বেতন-ভাতাও প্রদান করেনি। তবে, জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমসহ সরকারি মসজিদসমূহে ইমাম নিয়োগ ও অপসারণে সরকারের কর্তৃত্ব রয়েছে এবং এ সব মসজিদে খুতবার বিষয়বস্তু কি হবে তা নির্বাচনে সরকার পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

সরকার মাদ্রাসাগুলোর শিক্ষাদানের বিষয়বস্তু পর্যবেক্ষণ করেছে এবং ঘোষণা করেছে যে, মাদ্রাসাগুলোর পাঠ্যক্রমে পরিবর্তন আনা হবে এবং এসব পরিবর্তনের মধ্যে থাকবে ধর্মীয় শিক্ষার আধুনিকায়ন এবং তা শিক্ষার মূল ধারায় সম্পৃক্ত করা।

শরি'য়া মুসলমান সম্প্রদায়ের দেওয়ানি বিষয়ে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করেছে। তবে এই আইন আনুষ্ঠানিকভাবে বাস্তবায়ন করা হয়নি এবং তা অ-মুসলিমদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়নি। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, ভূমির মালিকানার সাথে সম্পর্কযুক্ত নয় এমন দেওয়ানি বিষয়ে এবং পারিবারিক কলহ নিরসনে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা রয়েছে। উভয় পক্ষের সম্মতিতে এ ধরনের বিবাদ নিরসনে মধ্যস্থতাকারীরা শরিয়া'র মূলনীতির ওপর নির্ভর করেছেন। এছাড়াও মুসলিম পারিবারিক আইন শিথিলভাবে শরিয়া'র ওপর ভিত্তি করে তৈরি।

হাইকোর্ট ২০০১ সালে শরি'য়ার ওপর নির্ভর করে সকল আইনি মতামত প্রদান বা ফতোয়াকে বেআইনি ঘোষণা করে। তবে, একদল ধর্মীয় নেতা এর বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করায় এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করা যায়নি। যে সময়কালের আলোকে এই প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে সে সময়কালের শেষ পর্যন্ত বিষয়টি অমীমাংসিতই ছিল।

যদিও ইসলামি ঐতিহ্য অনুযায়ী শুধুমাত্র মুফতি বা ইসলামি আইনে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতই কেবল ফতোয়া দেবার অধিকারী, সেখানে গ্রাম্য মৌলভিরাও কখনও কখনও কোন ব্যক্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। এই জাতীয় ঘোষণার কারণে কোন কোন সময় বিচার বহির্ভূত শাস্তি প্রদান করা হয়েছে - যা প্রায়শই হয়েছে নারীদের বিরুদ্ধে অনুমিত নৈতিক স্খলনের অপরাধে।

সংবিধানে নাগরিকদের নিজের পছন্দের ধর্ম প্রচারের অধিকার রয়েছে; তবে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং সমাজ ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের অন্য ধর্মে দীক্ষিত করার প্রয়াসের প্রায়শই বিরোধিতা করেছে।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিজ নিজ ধর্ম অনুযায়ী বিবাহ, তালাক ও দত্তক গ্রহণ সংক্রান্ত পারিবারিক আইনের কিছুটা তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নিজস্ব পারিবারিক আইন রয়েছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, একজন মুসলমান পুরুষ চারটা পর্যন্ত বিবাহ করতে পারেন; তবে এক্ষেত্রে অতিরিক্ত স্ত্রী গ্রহণের জন্য তাকে প্রথম স্ত্রীর লিখিত অনুমতি গ্রহণ করতে হয়। সমাজ বহুবিবাহ ব্যবস্থা দারুণভাবে নিরুৎসাহিত করে। বহু বিবাহের প্রচলন নেই বললেই চলে। অপরদিকে, একজন খ্রিস্টান পুরুষ মাত্র একজন মহিলাকে বিবাহ করতে পারেন। হিন্দু আইনে সীমাহীন বহুবিবাহের অনুমতি দেয়া হয়েছে; তবে তালাক বা আইনগত বিচ্ছেদের কোন বিধান নেই। হিন্দু বিধবারা আইনগতভাবে পুনর্বিবাহ করতে পারেন। বিয়ের আচার-অনুষ্ঠান ও পদ্ধতি সংশিষ্ট ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির পারিবারিক বিধান অনুযায়ী সম্পন্ন হয়ে থাকে। তবে রাষ্ট্রের বিধান অনুযায়ী বিয়ের নিবন্ধনও করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোর নারী-পুরুষের মধ্যে আন্তঃধর্ম বিবাহের ক্ষেত্রে কোন আইনগত প্রতিবন্ধকতা নেই।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান ২০০৮ সালের মার্চ মাসের ৮ তারিখ নারী উন্নয়ন নীতি ঘোষণা করেন। এই ঘোষণার বিরুদ্ধে কয়েকটি ইসলামপন্থী দল সহিংস প্রতিবাদ জানায়। তাদের বক্তব্য হলো, এই নীতিতে নারী ও পুরুষকে সম-উত্তরাধিকার দেয়ার কথা বলা হয়েছে, যা শরি'য়া নীতিমালা ও সেই সঙ্গে মুসলিম পারিবারিক আইনের সাথে সাংঘর্ষিক। এই নীতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে: মহিলাদের জন্য সংসদের এক তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষিত রাখা এবং সেসব আসনে সরাসরি নির্বাচন অনুষ্ঠান, এবং সেই সঙ্গে মহিলারা যাতে তাদের অর্জিত সম্পত্তি রক্ষার সমান সুযোগ পান তা নিশ্চিত করা। যদিও সরকারের উপদেষ্টাবর্গ (মন্ত্রী মর্যাদার) প্রকাশ্যে এই সব সমালোচনা খণ্ডন করেছেন, তথাপি ঘোষিত এই নীতি পর্যালোচনার জন্য সরকার আলেমদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে দেন। জাতীয় মসজিদের শীর্ষ ধর্মীয় নেতাকে প্রধান করে গঠিত এই কমিটি এই নীতিতে পরিবর্তন আনার বেশ কয়েকটি সুপারিশ করেন। যদিও তারপর তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যাপারটি নিয়ে আর উচ্চবাচ্য করেনি, কিন্তু সরকারি কর্মকর্তারা ঘরোয়াভাবে স্বীকার করেছেন যে, অন্য পন্থায় মহিলা উন্নয়ন নীতিমালার কিছু অংশের বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে - যেমন দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির বাস্তবায়ন। এ বিষয়ে নতুন সরকারের রয়েছে নিজস্ব নীতি, যা তারা তাদের বিগত ক্ষমতায় থাকার সময় প্রণয়ন করেছে, তবে আলোচ্য সময়ের শেষ পর্যন্ত তারা সেই নীতি আবার বাস্তবায়ন করা হবে কি না তা ঘোষণা করেনি।

ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের জন্য ধর্ম মন্ত্রণালয় তিনটি তহবিল পরিচালনা করেছে: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, হিন্দু কল্যাণ ট্রাস্ট ও বৌদ্ধ কল্যাণ ট্রাস্ট। খ্রিস্টান সম্প্রদায় তাদের ধর্মীয় ব্যাপারে সরকারের সংশ্লিষ্টতা বরাবর প্রত্যাখ্যান করে এসেছে। ২০০৯ সালের জুন মাসে শেষ হওয়া অর্থ বছরে হিন্দু কল্যাণ ট্রাস্ট সরকারের কাছ থেকে মোট ৮৮২,৪০০ ডলার (৬ কোটি টাকা) পেয়েছে। এই অর্থের বেশিরভাগই ব্যয় হয়েছে মন্দির-ভিত্তিক সাক্ষরতা ও ধর্মীয় কর্মসূচিতে। ট্রাস্টের অর্থ মন্দির সংস্কার, চিতার চূলা সংস্কার এবং দুঃস্থ হিন্দু পরিবারের চিকিৎসা খরচ নির্বাহের জন্য ব্যয় করা হয়েছে। এ ছাড়াও ট্রাস্ট বার্ষিক পূজা উদ্‌যাপন, ধর্মীয় প্রার্থনা অনুষ্ঠান ও উৎসবের জন্য সরকারি তহবিল থেকে পাওয়া প্রায় ৪৩,৪৭৮ ডলার (৩০ লক্ষ টাকা) ব্যয় করেছে।

বৌদ্ধ কল্যাণ ট্রাস্ট ২০০৯ সালের জুন মাসে সমাপ্ত অর্থবছরে সরকারের কাছ থেকে ৩৩ হাজার ৩৩৩ ডলার (২৩ লাখ টাকা) পেয়েছে। ট্রাস্টটি প্রতিষ্ঠিত হয় আশির দশকে। ট্রাস্ট এই অর্থ বৌদ্ধ বিহার

মেরামত, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের প্রশিক্ষণ দান এবং বৌদ্ধ পূর্ণিমা উদ্‌যাপনের জন্য ব্যয় করেছে। কিভাবে এই অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে বা ব্যবহার করা হয়েছে সে বিষয়ে কোন প্রকাশ্য সমালোচনা শোনা যায়নি।

সরকার মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান ধর্মীয় উৎসব ও পবিত্র দিনগুলোকে জাতীয় ছুটির দিন হিসেবে উদ্‌যাপন করেছে। বাংলাদেশ খ্রিস্টান সমিতি ঈস্টার দিবসকে জাতীয় ছুটি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা চালিয়ে এখনো সফল হতে পারেনি।

২০০১ সালের পর থেকে সরকার উগ্রপন্থী হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হতে পারে এমন সব ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠানের সময় নিয়মিতভাবে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার লোকদের মোতায়েন করেছে।

অ-মুসলিম ধর্মীয় সংগঠনগুলোকে সরকারের নিবন্ধন নেয়ার প্রয়োজন হয়নি; তবে ধর্মীয় সংগঠনসহ সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বিদেশি আর্থিক সহায়তা লাভ করে - এমন সকল বেসরকারি সংস্থা বা এনজিওকে সরকারের এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে নিবন্ধিত হতে হয়েছে। যদি এই মর্মে সন্দেহ হয় যে, সংস্থাগুলো তাদের আইনগত ও আস্থার বাধ্যবাধকতা ভঙ্গ করেছে, তাহলে তাদের নিবন্ধন বাতিল করার আইনগত ক্ষমতা সরকারের ছিল। এদের বিরুদ্ধে বিদেশী তহবিল আনা বন্ধ করে তাদের কার্যক্রম সীমিত করার মত ব্যবস্থা নেয়ার কর্তৃত্বও ছিল সরকারের।

ধর্মীয় শিক্ষা সরকারি স্কুলসমূহের পাঠ্যক্রমের একটা অংশ ছিল। ছেলে-মেয়েরা স্কুলে তাদের নিজ নিজ ধর্মশিক্ষার পাঠ নিয়েছে। অতীতে অভিভাবকরা ধর্মীয় শিক্ষাদানের মান নিয়ে অভিযোগ করেছেন। তারা বলেছেন, সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় শিক্ষার জন্য সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকরা এই সব সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্য নন এবং ঐ বিষয়ে শিক্ষা দেবার মত যথেষ্ট যোগ্যতাও তাদের নেই। অতি অল্প সংখ্যক ধর্মীয় সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রী আছে - এমন স্কুলগুলো তাদের সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের ধর্মীয় শিক্ষা দেবার জন্য স্থানীয় মন্দির বা গির্জার সাথে একটা ব্যবস্থা করে দিয়েছে। স্কুল সময়ের বাইরে এসব পাঠদান অনুষ্ঠিত হয়েছে। যদিও এসব স্থানে ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবহণের সমস্যা প্রায়শই ছিল। দেশে কমপক্ষে ২৫ হাজার মাদরাসা আছে- যার কিছু কিছু চলে সরকারি অর্থায়নে। কোন কোন পর্যবেক্ষক মনে করেন, মাদরাসার এই সংখ্যা দ্বিগুণ হতে পারে। বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউটের হিসাব মতে দেশে মাদরাসার সংখ্যা প্রায় ৩৩ হাজার। জানা মতে, সরকার পরিচালিত কোন খ্রিস্টান, হিন্দু বা বৌদ্ধ স্কুল নাই, যদিও সারা দেশে বেসরকারি ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

ধর্মীয় স্বাধীনতার ওপর বিধি-নিষেধঃ

বাংলাদেশের সংবিধানে যে কোন ধর্ম গ্রহণ, পালন বা প্রচারের অধিকার রয়েছে, তবে সামাজিক চাপ কাউকে উদ্বুদ্ধ করে ধর্মান্তরিতকরণ নিরুৎসাহিত করেছে। বিদেশী অধিবাসীদের মত বিদেশী ধর্মীয় মিশনারিদেরও ভিসা প্রাপ্তি ও নবায়নের ক্ষেত্রে প্রায়শই বেশ কয়েক মাস অপেক্ষা করতে হয়েছে। পূর্ববর্তী প্রতিবেদন সময়কালে ঘটে থাকলেও বর্তমান প্রতিবেদনকালে আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বাহিনী ও সামরিক গোয়েন্দারা মিশনারিদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেছে বলে মিশনারিরা কোন অভিযোগ করেননি।

ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে কোন আর্থিক শাস্তির বিধান করা হয়নি; তবে নির্বাচিত জন-প্রতিনিধির পদসহ সামরিক ও সরকারি চাকুরিতে প্রবেশের ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের সুযোগ তুলনামূলকভাবে কম ছিল।

ব্যক্তিগত তথ্য-উপাত্তে দেখা যাচ্ছে, সরকারের সকল পর্যায়ে নতুন সরকার আরো বেশি ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিয়োগ দিয়েছে। নতুন মন্ত্রীসভার ৩৮ জন সদস্যের মধ্যে তিন জন অমুসলিম। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুইজন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীকেও মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করেন। এরা হলেন- শিল্পমন্ত্রী দীলিপ বড়ুয়া এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী দীপঙ্কর তালুকদার। প্রধানমন্ত্রী একজন হিন্দু ধর্মাবলম্বীকে পানি সম্পদ মন্ত্রী নিয়োগ করেন। তিনি হচ্ছেন- রমেশ চন্দ্র সেন। সাধারণভাবে সরকারের উচ্চপদে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব কম ছিল। একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ছিল সরকার পরিচালিত বাংলাদেশ ব্যাংক - যেখানে উচ্চ পদে প্রায় ১০% অমুসলিম নিয়োগ পেয়েছেন। সরকারি চাকুরির জন্য গঠিত নির্বাচনী বোর্ডে প্রায়ই সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব থাকে না। নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি কোন ধর্মে বিশ্বাসী তা প্রকাশ করার কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না, তবে ব্যক্তির নাম থেকেই তা সহজে নির্ধারণ করা যায়।

বাতিল হয়ে যাওয়া অর্পিত সম্পত্তি আইনের আওতায় করা বৈষম্যের কারণে অনেক হিন্দু তাদের হারানো ভূ-সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেননি। যদিও এক আওয়ামী লীগ সরকার ২০০১ সালে এই আইন বাতিল করে, তথাপি নতুন সরকার উক্ত আইনবলে জব্দ করা হিন্দু সম্পত্তি ফেরতদানে কোন বাস্তব পদক্ষেপ নেয়নি। এই আইন ছিল পূর্ব পাকিস্তান যুগের - যা সরকারকে শত্রুদের (বাস্তবে হিন্দুদের) জমি অধিগ্রহণ করার ক্ষমতা দিয়েছিল। এই আইন বলে সরকার প্রায় ২৬ লক্ষ একর হিন্দু সম্পত্তি অধিগ্রহণ করে - যার ফলে দেশের প্রায় সকল হিন্দুই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক পরিচালিত সমীক্ষায় জানা যায়, ২০০১ সালে অর্পিত সম্পত্তি আইন বাতিল করা সত্ত্বেও সেই সাল থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ২০০,০০০ হিন্দু পরিবার প্রায় ৪০,৬৬৭ একর জমি হারিয়েছেন।

২০০১ সালের এপ্রিল মাসে জাতীয় সংসদে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন পাশ করা হয়। এই আইনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অর্পিত সম্পত্তি আইনের আওতায় জব্দকরা সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকা সম্পত্তি মূল মালিক বা তাদের উত্তরাধিকারীদের ফেরত দেয়া হবে- যদি তারা বা তাদের উত্তরাধিকারীরা বাংলাদেশে বসবাসরত নাগরিক হন। ২০০১ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যে অর্পিত সম্পত্তির একটি তালিকা সরকারের প্রস্তুত করার কথা বলা হয়েছিল এবং এই তালিকা প্রকাশের নব্বই দিনের মধ্যে দাবিদারদের মালিকানার দাবি পেশ করার কথা বলা হয়েছিল। সংসদ ২০০২ সালে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের একটি সংশোধনী পাশ করে - যাতে সরকারকে অর্পিত সম্পত্তি ফেরতদানের জন্য সীমাহীন সময় দেয়া হয়, এবং ইজারা দেবার ক্ষমতাসহ এই সব সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা দেয়া হয় স্থানীয় পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদের। যে সময়কালকে ধরে এই প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে সে সময়ের শেষ পর্যন্ত সরকার এই ধরনের সম্পত্তির কোন তালিকা প্রস্তুত করেনি।

মুসলিম পারিবারিক আইন অনুসারে মহিলারা পুরুষ আত্মীয়দের তুলনায় কম সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে থাকেন এবং তালাকের ক্ষেত্রে স্বামীদের চেয়ে স্ত্রীদের অধিকার কম। আইন ইচ্ছামাফিক তালাক প্রদান এবং স্বামী কর্তৃক প্রথম স্ত্রীর সম্মতি ব্যতিরেকে বহু বিবাহের বিরুদ্ধে মহিলাদের কিছুটা সুরক্ষা প্রদান করেছে। তবে এই ধরনের সুরক্ষা শুধুমাত্র নিবন্ধনকৃত বিবাহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ আইন সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে গ্রাম অঞ্চলে কখনও কখনও বিবাহ নিবন্ধন করা হয় না। আইন অনুসারে একজন মুসলমান স্বামীকে তার পূর্বতন স্ত্রীকে তিন মাস খোরপোশ দিতে হয়, কিন্তু এই আইন সব সময় বলবৎ করা হয় না। বিষয়টি বলবৎ করার ক্ষেত্রে সামাজিক চাপ ছিল খুবই কম এবং আদালতে এতই অ-নিষ্পন্ন মামলার চাপ থাকে যে, আদালতের মাধ্যমে এ বিষয়ে প্রতিকার পাওয়া অসম্ভব না হলেও- বেশ কঠিন।

ধর্মীয় স্বাধীনতার অপব্যবহার

১৫ই মার্চ, ২০০৮ তারিখে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের ব্রাহ্মণবাড়িয়া শাখা আহমদিয়াদেরকে তাদের একটি ধর্মীয় সম্মেলন অনুষ্ঠান করতে বাধা দেয়। পরে ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপে গোয়েন্দা বিভাগ তাদের আপত্তি তুলে নিলে অবশ্য শান্তিপূর্ণভাবেই তাদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ২০০৮ সালের মার্চ মাসের ২১ তারিখে পঞ্চগড় জেলার শালসিঁড়িতে অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটে। প্রতিবেদনে আলোচ্য সময়ে এই দুটি ঘটনার বা অনুরূপ কোন ঘটনার ব্যাপারে আর কোন অগ্রগতি হয়নি।

প্রথম আলো পত্রিকার সাবেক কার্টুনিস্ট আরিফুর রহমান- যিনি ২০০৭ সালে ইসলামের প্রতি অবমাননাকর বলে বিবেচিত একটি কার্টুন প্রকাশ করে জাতীয় পর্যায়ে বিক্ষোভের সঞ্চার করেছিলেন- এখন অন্য একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন। শীর্ষস্থানীয় পত্রিকা প্রথম আলোর সম্পাদক কার্টুনটি প্রকাশিত হবার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং আরিফুর রহমানকে বরখাস্ত করেন। এই ঘটনারও কোন অগ্রগতি নেই।

ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে দেশে কাউকে আটক বা বন্দী রাখার কোন খবর পাওয়া যায়নি।

বলপূর্বক ধর্মান্তর

জোর করে ধর্মান্তরিত করার একটি ঘটনার খবর পাওয়া গেছে। মানবাধিকার নিয়ে কাজ করে এমন এনজিও আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) সূত্রে জানা যায়, ঢাকার শাহবাগ এলাকার নিকটে অবস্থিত একটি মাদ্রাসার একজন হুজুর ২০০৮ সালের ৪ঠা জুলাই পরেশ চন্দ্র সরকার নামের ১৩ বছর বয়সী এক হিন্দু ছেলেকে জোর করে অপহরণ করে তাকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে। পরেশ নিখোঁজ থাকার ব্যাপারে তার পরিবার পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ পরেশকে খুঁজে বের করে এবং তার অপহরণকারীসহ তাকে আটক রাখে। প্রতিবেদনে আলোচ্য সময়ে এই বালকটির মামলা অ-নিষ্পন্ন ছিল; এবং ছেলেটি তার পিতা-মাতার কাছে ফিরে যাবে, না মাদ্রাসায় যাবে সে বিষয়ে বিচারক কোন রায় এখনও দেননি।

ধর্মীয় স্বাধীনতার ক্ষেত্রে উন্নতি এবং ইতিবাচক ঘটনা

সরকার আন্তঃধর্ম সমঝোতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ নিয়েছে। যেমন, ধর্মীয় উৎসবের প্রাক্কালে সরকারের ঊধ্বতন কর্মকর্তারা বাণী দিয়ে শান্তির আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছিলেন যে, যারা উৎসবে বিঘ্ন ঘটাবার চেষ্টা করবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং বাণী দিয়ে সরকার দুর্গা পূজা, বড় দিন ও ঈস্টারসহ হিন্দু ও খ্রিস্টান উৎসব, এবং পহেলা বৈশাখের (বাংলা নববর্ষ) মত ধর্মনিরপেক্ষ উৎসবগুলো শান্তিপূর্ণভাবে পালনে সহায়তা করেছে। ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সরকার সংখ্যালঘু ভোটার প্রধান এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনীর অতিরিক্ত সদস্য মোতায়েন করেছিল।

সরকার কাউন্সিল ফর ইন্টারফেইথ হারমনি-বাংলাদেশ নামে ২০০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত সংগঠনটিকে সমর্থন ও সহায়তা প্রদান করেছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বোঝাপড়া বৃদ্ধি করা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান উন্নয়নের লক্ষ্যে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ২০০৫ সালের শরৎকালে একটি ইসলামি জঙ্গিবাদী গ্রুপ দেশে শরি'য়া আইন প্রতিষ্ঠার দাবিতে বোমাবাজি শুরু করলে তারই প্রত্যুত্তরে এই সংগঠনটির যাত্রা শুরু হয়। সংগঠনটি ধর্মীয় ব্যাপারে সংলাপ ও প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠানে সহায়তা করেছিল; স্থানীয় প্রচার মাধ্যম এসব তৎপরতার কিছু কিছু খবর প্রচার করেছিল।

অনুচ্ছেদ ৩ : সামাজিক নির্যাতন ও বৈষম্য

এই প্রতিবেদনে বিবেচনাধীন সময়ে ধর্মীয় বিশ্বাস বা চর্চার ওপর ভিত্তি করে সামাজিক নির্যাতন ও বৈষম্যের ঘটনা ঘটার খবর পাওয়া গেছে। বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে কখনও কখনও সংঘর্ষ হয়েছে। সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সহিংসতা ঘটেছে যাতে তাদের জীবন ও সম্পত্তির ক্ষতিসাধন হয়েছে; তবে এসব ঘটনা ধর্মীয় বিদ্বেষ-প্রসূত, না অপরাধ সংঘটিত করার উদ্দেশ্যে, না সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধে সংঘটিত হয়েছিল তা প্রায়শই পরিষ্কার ছিল না। শক্তিধর রাজনীতিকদের ওপর নিজেদের প্রভাব অপেক্ষাকৃত সীমিত থাকায় ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা আলোচ্য সময়ে নাজুক অবস্থায় ছিলেন, অনেক নাগরিকদের মত তারাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুর্নীতিপ্রবণ ও অকার্যকর বলে বিবেচিত ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার শরণাপন্ন হতে আগ্রহী ছিলেন না। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ প্রায়শ অকার্যকর ছিল এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সাহায্যের বেলায় তাদের পদক্ষেপ কখনও কখনও মন্থর ছিল। এর ফলে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সহিংসতার ক্ষেত্রে এক ধরনের দায়মুক্ততার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। তবে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোক একে অপরের উৎসব-অনুষ্ঠান, যেমন, বিয়ে-শাদিতে, যোগ দিয়েছেন। সুন্নি মুসলমানদের কাছ থেকে কোন প্রকার বাধা ছাড়াই শিয়া মুসলমানরা তাদের ধর্ম বিশ্বাস পালন করেছেন।

বেসরকারি খাতে সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব কম ছিল না।

আলোচ্য সময়ে প্রকাশিত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংঘটিত সহিংস ঘটনাগুলোর মধ্যে ছিল: হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন, উপাসনালয়ে হামলা, বাড়ি-ঘর ধ্বংস, জোরপূর্বক উচ্ছেদ এবং আরাধ্য বস্তুর পবিত্রতা নষ্ট করা, ইত্যাদি। তবে এসব ঘটনার বেশিরভাগই নিরপেক্ষভাবে যাচাই করা যায়নি। মুসলমান সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যেও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পরস্পরের মধ্যে অনেক সহিংস ঘটনা ঘটেছে। কারণ এক দলের কোন কোন কাজকে অন্য দল ইসলাম-বিরোধী বলে ধারণা করেছেন। সরকার কোন কোন সময় এ ধরনের অপরাধ তদন্তে এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে মামলা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব অপরাধীরা ছিল স্থানীয় মাস্তানদের নেতা।

হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আক্রমণের ঘটনা অব্যাহত ছিল, যদিও পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে তা অনেক কম ছিল। বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের তথ্য অনুযায়ী ২০০৮ সালের এপ্রিল মাস থেকে ২০০৯ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত সময়ে ৩টি হত্যাকাণ্ড, উপাসনালয়ের ওপর ১০টি হামলা বা দখল, ১২টি ভূমি দখল এবং ২টি ধর্ষণ এবং ৩টি অপহরণের ঘটনা ঘটেছে।

দৈনিক *সমকাল* পত্রিকা সূত্রে জানা যায়, ২০০৯ সালের ৩০শে মার্চ তারিখে ৫০ জন পুলিশ অফিসার এবং অন্যান্য ১০০ ব্যক্তি পুরাতন ঢাকার সুত্রাপুরে প্রায় ৪০০ ব্যক্তিকে তাদের পৈত্রিক ঘরবাড়ি থেকে

উচ্ছেদ করে এবং তাদের ঘরবাড়ি হাতুড়ি দিয়ে ভেঙ্গে ফেলা হয়। এসব ব্যক্তির বেশিরভাই ছিলেন হিন্দু। হামলাকারীরা কালিরঘাটের প্রাচীনতম শিব মন্দিরটি ভেঙ্গে দেয়। স্থানীয় একজন আওয়ামী লীগ নেতার ভাই এই উচ্ছেদ ও ভাঙ্গচুরের নেতৃত্ব দেন বলে জানা যায়। উচ্ছেদের শিকার ব্যক্তিরা অভিযোগ করেন, যে জমি থেকে তাদের উচ্ছেদ করা হয় তা তাদের নামে ১৯৪৫ সালে রেজিস্ট্রি করা হয়। তারা এই জমির পৌর করসহ অন্যান্য সেবা বিল দিয়ে আসছেন। অর্পিত সম্পত্তি আইন পাশ হওয়ার পর জায়গাটিকে একটি "অর্পিত সম্পত্তি" হিসাবে নথিভুক্ত করা হয়। হিন্দু বাসিন্দারা অভিযোগ করেন, সম্পত্তিটির মালিকানা দাবি করে স্থানীয় কয়েকজন প্রভাবশালী নেতা মামলা দায়ের করেছেন। হিন্দুরা অবৈধভাবে জায়গাটি দখলে রেখেছিল বলে দাবি করে পুলিশ হিন্দু বাসিন্দাদের বিপক্ষে অবস্থান নেয়।

বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ এবং সমকাল পত্রিকা জানায়, ২০০৯ সালের ২৮শে জানুয়ারি ফরিদপুরে স্থানীয় একজন সাবেক রাজনীতিদিবদের নেতৃত্বে একদল লোক স্থানীয় শ্মশান কালী (হিন্দু) মন্দিরের প্রতিমা ভাঙ্গচুর করে পরে মন্দিরটি পুড়িয়ে দেয়।

প্রথম আলো পত্রিকা এবং বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ জানায়, ২০০৯ সালের ১০ই জানুয়ারি ঢাকার অদূরে গাজীপুরের হিন্দু প্রধান একটি গ্রামে দেড় শতাধিক সশস্ত্র ব্যক্তি হামলা চালায়। গ্রামের কিশোরী মেয়েদের ওপর যৌন হয়রানি করা হচ্ছে বলে গ্রামের কয়েকজন বাসিন্দা অভিযোগ করার পর তাদের গ্রামে এই হামলা চালানো হয়। সশস্ত্র ব্যক্তিরা গ্রামের অনেক ব্যক্তির ওপর হামলা চালায়, কয়েকটি বাড়ি ভাঙ্গচুর করে এবং কয়েকজন মহিলাকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে। গ্রামের একমাত্র কালী মন্দিরটির কালী মূর্তিটিও তারা ভেঙ্গে ফেলে।

গতবছর ২৯শে ডিসেম্বর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাত্র দুই দিন পর প্রায় জনা ১৫ লোক চাকু ও লাঠিসটা নিয়ে সংখ্যালঘু হিন্দু ধর্মের সদস্য নিত্যলাল দাসের বাড়িতে হামলা চালিয়ে তাকে মারধর ও ছুরিকাঘাত করে। নিত্যলাল কিশোরগঞ্জ জেলার কুলিয়ারচরে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) স্থানীয় নেতা ছিলেন। মানবাধিকার সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) তদন্তকারীদের কাছে তার পরিবার হামলাকারীদের পরিচয় বা তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু প্রকাশ করতে রাজি হয়নি। তবে আসকের তদন্তকারীরা প্রতিবেশীদের কাছ থেকে জানতে পারেন, বিএনপির স্থানীয় প্রভাবশালী হিন্দু নেতা হওয়ার কারণে তার ওপর এই হামলা হয়েছে বলে তারা মনে করেন। পত্রিকার খবরে বলা হয়, এই হামলার নেতৃত্বে ছিল স্থানীয় একজন আওয়ামী লীগ নেতার ভাই আবুল মনসুর রুবেল এবং ভাতিজা জিশান। কিশোরগঞ্জ ৬ আসন (ভৈরব-কুলিয়ারচর) থেকে চার দলীয় জোটের পরাজিত প্রার্থী শরিফুল আলম জানান, নিত্যলাল দাস তার প্রতি অনাকাঙ্ক্ষিত মনোযোগ আকৃষ্ট হতে পারে -এই আশঙ্কায় অভিযোগ দায়ের করেননি।

২০০৮ সালের ৫ই ডিসেম্বর কয়েক ব্যক্তি ঢাকার অদূরে কেরানিগঞ্জে বিবদমান একটি জমিতে অবস্থিত কালী মন্দিরের অংশ বিশেষ ধ্বংস করে মন্দিরের গায়ে সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দেয় যে, তারা এই জমির মালিক। মন্দির চত্বরের বাসিন্দা রেখা ভট্টাচার্য মন্দিরে ভাঙ্গচুর করার দায়ে পাঁচ জনেরও বেশি ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করে একটি ফৌজদারি মামলা দায়ের করেন। রেখা ভট্টাচার্য দাবি করেন, জমির মূল মালিক মন্দির নির্মাণের জন্য জমিটি দান করেছেন। আর আসামী দাবি করেন, তিনি মূল মালিকের কাছ থেকে জমিটি কিনেছেন। আসক জানায়, এই হামলার কারণে এলাকার হিন্দুরা অনেক ভয়ে রয়েছেন।

আলোচ্য সময়ে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ওপর হয়রানি ও সহিংসতার ঘটনা ঘটার কথা জানা গেছে।

বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ এবং প্রথম আলো সূত্রে জানা যায় যে, ২০০৯ সালের ২৮শে জানুয়ারি তারিখে টাঙ্গাইলে অজ্ঞাতনামা হামলাকারীদের একটি দল গৈরা মিশনারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাসন্তী মাংসাকে হত্যা করে। বাসন্তী ছিলেন একজন খ্রিস্টান। তিনি ওই সময় একটি বৈঠক শেষে বাড়িতে ফিরছিলেন। এই হামলা সুপরিকল্পিত ছিল বলে মনে করা হয়। এতে আরো দুই জন শিক্ষক আহত হন। এই হত্যাকাণ্ডের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু জানা যায় নাই। মামলাটিরও নিষ্পত্তি হয়নি।

মানবাধিকার সংস্থা এবং পত্র-পত্রিকার খবরে বলা হয়, পল্লি অঞ্চলে নৈতিক স্খলনের অভিযোগে নারীদের বিরুদ্ধে বিচার হাতে তুলে নেয়ার ঘটনা ঘটেছে। প্রায়শই ফতোয়ার ওপর ভিত্তি করে নারীদেরকে বেত্রাঘাতসহ নানা প্রকার শাস্তি প্রদান করে। প্রধানত নারীর অধিকার নিয়ে কাজ করে এমন মানবাধিকার সংস্থা বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ জানায়, ২০০৮ সালে এবং আলোচ্য সময়ের শেষ নাগাদ গ্রাম্য মৌলভিরা ৩৭ টি ফতোয়া দিয়েছেন। এসব ফতোয়ায় বেত্রাঘাতসহ অন্যান্য শারীরিক শাস্তি এবং পরিবার ও সমাজের লোকদের দ্বারা একঘরে করে রাখার বিধানও ছিল।

ঢাকা ও অন্যান্য কয়েকটি স্থানে প্রায় এক লাখ আহমদিয়া বসবাস করেন। মূলধারার মুসলমানরা আহমদিয়াদের মতবাদ প্রত্যাখ্যান করেন, তবে অধিকাংশ লোক কোন প্রকার ভয়ভীতি ও নির্যাতন ছাড়া নিজ ধর্ম পালন করার আহমদিয়াদের অধিকার সমর্থন করেন। পূর্ববর্তী প্রতিবেদন সময়ের চেয়ে বর্তমান প্রতিবেদন সময়ে আহমদিয়া মতবাদ বিরোধীদের দ্বারা হয়রানির ঘটনা হ্রাস পেয়েছে।

প্রথম আলো পত্রিকার খবরে জানা যায়, ২০০৮ সালের ২৭শে জুলাই 'আমরা ঢাকাবাসী' নামের একটি মুসলিম ধর্মীয় উগ্রবাদী দল আহমদিয়াদের অ-মুসলিম ঘোষণার আন্দোলন পুনরায় শুরু করার ঘোষণা দেয়। সংগঠনটি দেশের ৬৪টি জেলার সবকটিতে আহমদিয়া সম্প্রদায়ের নেতাদের বিরুদ্ধে দেওয়ানি মামলা দায়ের করে এবং আহমদিয়া নেতৃত্বের বিরুদ্ধে মোবাইল ফোনে সংক্ষিপ্ত বার্তা (মেসেজ) পাঠিয়ে অপপ্রচার চালানো শুরু করে। আলোচ্য সময়ের শেষ পর্যন্ত এসব প্রয়াস আহমদিয়া সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ব্যাপক অসন্তোষ সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ৪: যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নীতি

যুক্তরাষ্ট্র সরকার ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়টি বাংলাদেশ সরকারের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা, রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এবং ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করে থাকে। প্রতিবেদনে বিবেচনাধীন সময়ে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস ২০০৮ সালের জাতীয় সংসদের নির্বাচন যাতে অবাধ, সুষ্ঠু ও বিশ্বাসযোগ্য হয়, এবং সে নির্বাচনে যাতে সকল জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় পুরাপুরি অংশ নিতে পারে তার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেছে। নির্বাচনের পর দূতাবাস অংশগ্রহণমূলক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ওপর জোর প্রদান করে যাতে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলে অংশগ্রহণ করতে পারেন। দূতাবাস ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের অধিকারসহ সকল প্রকার মানবাধিকার লঙ্ঘনের ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ অব্যাহত রাখে। দূতাবাসের কর্মকর্তারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাসহ অন্যান্য ঘটনা অনুসন্ধান করেন এবং সুশীল সমাজের সদস্য, এনজিও ও স্থানীয় ধর্মীয় নেতা এবং অন্যান্য নাগরিকদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। নির্বাচন-পূর্ব ও

নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতার উদ্বেগ নিয়েও তারা আলোচনা করেন। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার সুরক্ষার লক্ষ্যে আইন প্রয়োগকারীদের উদ্যোগী ভূমিকা নেয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করেন।

দূতাবাস ও যুক্তরাষ্ট্রের সফরকারী সরকারি কর্মকর্তারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উদ্বেগ শোনার জন্য এবং তাদের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনের বিষয়টি জানানোর জন্য উক্ত সম্প্রদায়ের সদস্যদের সাথে নিয়মিত দেখা-সাক্ষাৎ করেছেন। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে রাষ্ট্রদূত ঢাকার বিখ্যাত একটি হিন্দু মন্দির পরিদর্শন করেন। সেখানে হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্য ছিল অংশগ্রহণমূলক ও সহিংসতামুক্ত নির্বাচন প্রক্রিয়ার ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সমর্থন জ্ঞাপন করা। নির্বাচনের দিন তিনি একটি হিন্দু-প্রধান ভোট কেন্দ্রে পরিদর্শন করেন।

যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস যুক্তরাষ্ট্রের ধর্মভিত্তিক ত্রাণ সংস্থাগুলোকে সহায়তা প্রদান করেছে যাতে তারা স্কুল ও অন্যান্য প্রকল্প অনুমোদনের জন্য কাগজপত্র তৈরি করতে পারে। বাংলাদেশ সরকার এসব বিষয়ে আলোচনা করতে আগ্রহী ছিল এবং সাধারণভাবে সমস্যা সমাধানে সহায়ক ছিল। যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এসব সংস্থার পক্ষে কাজ করেছে- যাতে তাদের ভিসা সমস্যার সমাধান হয়।

ইমাম প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারকে উৎসাহিত করেছে। একটি পাইলট প্রকল্পের পর যুক্তরাষ্ট্র সরকার ইমামদের জন্য অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে মানবাধিকার ও নারী-পুরুষ সমতার বিষয়ে প্রশিক্ষণ অধিবেশনের আয়োজন করেছে। টানা চতুর্থ বছরের মত যুক্তরাষ্ট্র সরকার যুক্তরাষ্ট্রের একজন প্রখ্যাত মুসলমান আলেমকে এদেশে সফরে এসে বাংলাদেশী শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করার ব্যবস্থা করে। এই আলেম দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় শহর চট্টগ্রাম সফর করেন এবং ঢাকাতেও বেশ কয়েকদল শ্রোতার সামনে বয়ান দেন। তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল পবিত্র কুরআনে বর্ণিত সহিষ্ণুতা, স্বাধীনতা ও নারীপুরুষ সমতার বিষয়গুলির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তুলে ধরা।

প্রতিবেদনে বিবেচনাধীন সময়কালে যুক্তরাষ্ট্র সরকার বাংলাদেশ সরকারের কর্মকর্তাদের সাথে অনুষ্ঠিত বৈঠকে আলোচ্য বিষয় হিসেবে ধর্মীয় স্বাধীনতা, বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী মানুষজন যে সব সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন সেসব বিষয় বারবার উত্থাপন করে এসেছে। রাষ্ট্রদূতসহ দূতাবাসের কর্মকর্তারা আলোচ্য সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম সফর করে সেখানকার ঊর্ধতন সরকারি কর্মকর্তাদেরকে সেখানকার সংখ্যালঘুদের প্রতি করা আচরণে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগের কথা পৌঁছে দিয়েছেন।

বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্র সমর্থিত গণতন্ত্র ও সুশাসন কর্মসূচির মধ্যে ছিল সহিষ্ণুতা ও সংখ্যালঘুদের অধিকারের বিষয়।